চাষবাস

আবহাওয়া

২৭ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রযোজ্য আগাম আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা

আগামী দিনগুলোতে কোনও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫.৫ থেকে ২৭.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.২ থেকে ১৭.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। আগামী পাঁচ দিন আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা আছে। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৯ থেকে ৭২ শতাংশ এবং বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩০ থেকে ৪২ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বইতে পারে।

নগর বাঁচাবে উদ্যানপালন

উদ্যানপালন শহরের জীববৈচিত্র বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অনুকূল বাসস্থান, খাদ্য এবং সুরক্ষা প্রদান করে। একটি পরিপক্ক গাছ বছরে ১৫০ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। বাতাসের গুণমান উন্নত করতে পারে, শহরগুলিকে বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর জায়গা করে তুলতে পারে। বৃক্ষ, স্থানীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। ফল, শাকসবজি, বাদাম এবং পাতার মতো খাদ্য সরবরাহ করতে পারে। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুল এবং ফল বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক **তনুশ্রী কোলে এবং রাজদীপ মোহন্ত**।

নগরায়ন কী?

এটি বিশেষভাবে গাছপালা এবং শহুরে পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের অধ্যয়ন, অর্থাৎ গাছপালা এবং শহুরে এলাকার মধ্যে আন্তঃসংযোগের অনুশীলন। এটি উদ্যানপালনের কার্যকরী ব্যবহারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যাতে আশেপাশের শহুরে এলাকা বজায় রাখা এবং উন্নত করা যায়। শহর ও জনপদের বিস্তারের সাথে সাথে এটিকেও দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। তাই, উদ্যানপালন শহরের দৈনন্দিন জীবনের একটি নিয়মিত অংশ। শিল্প বিপ্লব এবং এর সাথে সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে দ্রুত 'ল্যান্ডস্কেপ' পরিবর্তিত হয় এবং ইট ও সিমেন্ট দিয়ে সবুজের স্থান প্রতিস্থাপিত হয়। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বিশ্বের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি এখন শহর ও শহরভিত্তিক এলাকায় বাস করে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটি ৬৬% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নগরায়নের কারণ

জনসংখ্যার চাপ এবং গ্রামীণ এলাকায় সম্পদের অভাবের কারণে গ্রাম থেকে নগর অভিবাসন ব্যাপক হারে ঘটছে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজন শহরে ব্যাপক ভাবে আসতে উদ্যোগী কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হবে। কিন্তু মৃত্যুহার হ্রাস এবং জন্মহার বৃদ্ধি, এক সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দিনের পর দিন চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

নগরায়নের বিভিন্ন প্রভাব

১) পরিবেশগত প্রভাব:শিল্পগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কঠিন বর্জ্য তৈরি হয় যা বড় শহরগুলির একটি প্রধান সমস্যা। মোটরচালিত পরিবহনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং শক্তি সরবরাহের জন্য কয়লা পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষণ হয়। অন্যদিকে, দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং জলপথে শিল্প ভারী ধাতু নিষ্পত্তির ফলে জল দূষণ হয়। যানজট এবং শব্দ দূষণও বড় শহরগুলির প্রধান পরিবেশগত প্রভাব। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, বায়ু দূষণ, জলের ঘাটতি, দূষণ এবং বনভূমির ক্ষয়, কৃষিজমি ও শহুরে বিস্তৃতির ফলে বন্যপ্রাণীর অবক্ষয় হচ্ছে যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক একটি হুমকি।

২) সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব:শহরগুলির আশেপাশের গ্রামীণ এলাকায় একটি শক্তিশালী সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে। গণমাধ্যমগুলি শহরের জীবনকে গ্রামীণ জীবনের চেয়ে উচ্চতর হিসাবে চিত্রিত করে, শহরে প্রচলিত ভাষাটিকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এর উচ্চ সম্পদের কারণে শহরে আরও ভাল পরিষেবা পাওয়া যায়। কৃষির অনুপস্থিতি, শিশুদের খরচ, শহরে খাবার ও থাকার জায়গা এবং পরিবার পরিকল্পনার কারণে শহরগুলিতে উর্বরতার হার প্রায়শই গ্রামীণ এলাকার তুলনায় কম হয়।

৩) আর্থ-সামাজিক প্রভাব:একটি শহর বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাসন এবং অবকাঠামোর ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়, কারণ সেখানে জল, জমি এবং নির্মাণ সামগ্রী কম পাওয়া যায় এবং তার সাথে লেগে থাকে বৃহত্তর যানজট সমস্যা। এভাবে শহুরে জীবনে বেকারত্বের সাথে বাড়ছে মাদকের অপব্যবহার, অপরাধ এবং গৃহহীনতা। কোনও ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা কৌশল ছাড়াই শহরগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে এবং এরকম জনবসতির চাপের ফলে শহর এবং এর আশেপাশের বন, ল্যান্ডস্কেপ এবং সবুজ অঞ্চলের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। পরিবেশগত প্রভাবগুলি প্রায়ই জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা তীব্র হয়, এতে দূষণ বৃদ্ধি, খাদ্য ও সম্পদের প্রাপ্যতা হ্রাস এবং সেইসাথে বর্ধিত দারিদ্রও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শহর এলাকায় গাছের গুরুত্ব

শহুরে গাছগুলি নগরায়নের কিছু নেতিবাচক প্রভাব এবং সামাজিক পরিণতি প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে এবং এইভাবে শহরগুলিকে এই পরিবর্তনগুলির জন্য আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলে। বৃক্ষ, স্থানীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে, ফল, শাকসবজি, বাদাম এবং পাতার মতো খাদ্য সরবরাহ করতে পারে যা মানুষের ব্যবহার এবং পশুখাদ্য উভয়ের জন্য। গাছের কাঠ রান্না এবং ঘর গরম করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবেই উদ্যানপালন শহুরে জীববৈচিত্র বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অনুকূল বাসস্থান, খাদ্য এবং সুরক্ষা প্রদান করে। একটি পরিপক্ক গাছ বছরে ১৫০ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বাতাসের গুণমান উন্নত করতে পারে, শহরগুলিকে বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর জায়গা করে তুলতে পারে। শহরে কৌশলগতভাবে গাছ স্থাপন করা বাতাসকে ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো শীতলতা প্রদান করতে সাহায্য করতে পারে। এগুলি শহুরে দূষণকারী যেমন কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ওজোন এবং সালফার অক্সাইড এবং ধুলো, ময়লা বা ধোঁয়ার মতো সূক্ষ্ম কণার জন্যও চমৎকার ফিল্টার যা পাতা এবং বাকলের উপর আটকে রেখে বাতাস থেকে বের করে দেয়। গবেষণা দেখায় যে শহুরে সবুজ স্থানের কাছাকাছি থাকা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস করে।

প্রথম পর্ব

সয়াবিনে শ্রীবৃদ্ধি

সয়াবিন বীজ কাঁচা, শুষ্ক অবস্থায় বা অঙ্কুরিত অবস্থায় খাওয়া যায়। সয়াবিন ময়দা থেকে কেক, রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার বানানো যায়। সয়াবিন তেল রান্নার কাজে, স্যালাড তেল ও মার্জারিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আরও বহুবিধ কাজে সয়াবিন তেল ব্যবহৃত হয়। সয়া মিল্ক, সয়া-পনির, সয়া-সস ও সয়া-ময়দা প্রভৃতি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য সয়াবিন বীজ থেকে তৈরি হয়। সয়াবিন চাষ করে কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে বাজারে ভাল দাম থাকায়। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্যবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক **ওসমান আলি**।

সয়াবিন [Soybean-Glycine max (L.), Merr. Leguminosae] পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিম্বগোত্রীয় তৈলবীজ। ভারতবর্ষে চিনাবাদাম ও রাই সর্ষের পরে সয়াবিন তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ। এটি হিন্দিতে ভাট বা রামকুর্থী নামে পরিচিত। সয়াবিনের অপর বৈজ্ঞানিক নাম গ্লাইসিন সোজা [Glycine soja (L.) Sieb & Zucc] বা সোজা ম্যাক্স [Soja max (L.) Piper] বা গ্লাইসিন হিসপিডা [Glycine hispida (Moench) Maxim]। সয়াবিনকে 'বিস্ময়কর বিন' ও বলা হয়।

পুষ্টিমূল্য

সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ অন্য যে কোনও খাদ্যশস্যর থেকে বেশি থাকে। ডাল জাতীয় অন্যান্য ফসল থেকেও এর পুষ্টিমান দ্বিগুণ এবং বাজারে সবচেয়ে সস্তা, খেশারী ডালের দামের অর্ধেক। তেল সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সয়াবিন ক্যালোরি ঘাটতি মেটাতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া এবং পরিবেশ সয়াবিন চাষের জন্য উপযোগী। সয়াবিনের ভাজা ডাল এবং খিচুরী অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও রুচিকর। সয়াবিন মূলত প্রোটিন ও তেলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিনে প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও ৪০-৪২ শতাংশ উন্নতমানের প্রোটিন উপস্থিত থাকে। সয়াবিন তেলের মধ্যে প্রধানত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং প্রধান অ্যামাইনো অ্যাসিড হিসাবে লাইসিন থাকে। তবে সয়াবীন বীজের মধ্যে পরিপাক পরিপন্থী পদার্থ হিসাবে ট্রিপসিন ইনহিবিটর, হেমাগ্লুটিনিন ও ওলিগোস্যাকারাইড বর্তমান।

ব্যবহার

সয়াবিন প্রোটিন ও তেলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন তেল রান্নার কাজে, স্যালাড তেল ও মার্জারিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফ্রোজেন ডেসার্ট, কুকি শর্টনিং, কনফেকশাস আইসিং, আইসক্রিম কোটিং, হুইপড টপিং ও কফি হোয়াইটনার তৈরিতে সয়াবীন তেল ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন তেল সাবান, রঙ, রেসিন, প্লিসারিন, ছাপার কালি, গ্রাজ, বার্নিশ, ড্রাই তেল শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সয়া মিল্ক, সয়া-পনির, সয়া-সস ও সরা-ময়দা প্রভৃতি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য সয়াবিন বীজ থেকে তৈরি হয়। সয়াবিন তেল উৎপাদনের সময় উপজাত হিসাবে উৎপাদিত 'সয়া-লেকিথেন' খাদ্য শিল্পে কোমলকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়া-খোল বা সয়ামিল পশু-পাখির খাদ্য। সয়াবীন খোলে ৭ থেকে ৮.৪৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ০.৭২ শতাংশ ফসফেট ও ২.১ শতাংশ পটাশ বর্তমান। সয়াবীন খোলে ৩৮-৪০ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সবুজ গাছ পশুখাদ্য হিসাবে এবং সয়াবিন সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন বীজ কাঁচা, শুষ্ক অবস্থায় বা অঙ্কুরিত অবস্থায় খাওয়া যায়। সয়াবিন ময়দা থেকে কেক, রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার বানানো যায়।

এলাকা

পৃথিবীর প্রধান ১০টি সয়াবিন উৎপাদক দেশ হল, আমেরিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভারত, চিন, প্যারাগুয়ে, কানাডা, বলিভিয়া, উরুগুয়ে ও ইন্দোনেশিয়া। ভারতের প্রধান প্রধান সয়াবীন উৎপাদক রাজ্যগুলি হল, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটক। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সয়াবিন উৎপাদক জেলা হল দার্জিলিং। এছাড়া বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় কিছু এলাকায় চাষ হয়। ২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫৮১ হেক্টর এলাকায় ৮১৬ কেজি/হেক্টর উৎপাদন হারে মোট ৪৭৪ টন সয়াবিন উৎপন্ন হয়েছে। সেখানে ২০১৯-২০ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৪৯ হেক্টর এলাকায় ৭৭৯ কেজি/হেক্টর উৎপাদন হারে মোট ১৯৪ টন সয়াবিন উৎপন্ন হয়েছে। এবং ২০২১-২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৪৪ হেক্টর এলাকায় ৮৪৮ কেজি/হেক্টর উৎপাদন হারে মোট ২০৭ টন সয়াবিন উৎপন্ন হয়েছে।

একক ফসল	সাথী ফসল
১। ধান - সয়াবিন	১। সয়াবিন + কলা
২। সয়াবিন -সরষে	২। সয়াবিন + অড়হর
৩। সয়াবিন — ভুট্টা	৩। ধান + সয়াবিন
৪। পাট -সয়াবিন	৪। আখ + সয়াবিন

শস্য পর্যায়

সয়াবিন বর্ষাকালীন ও শীতকালীন ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। একক বা সাথী ফসল হিসাবে লাগানো যায়।

মাটি ও আবহাওয়া

সয়াবিন বিভিন্ন মাটি ও আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে। তবে জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত বেলে-দোঁয়াশ ও এঁটেল-দোয়াঁশ মাটি বেশি উপযোগী। মাটির জলধারণ ক্ষমতা একটু বেশি হওয়া প্রয়োজন। সয়াবিন আলোকসংবেদনশীল ফসল। সয়াবিন দ্রুত অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

জাত

পশ্চিমবঙ্গের চাষের উপযোগী সয়াবিনের কয়েকটি জাত হল-পিকে-৪৭২, জেএস ৯৭-৫২, জেএস-৮০-২১, সমরুধী। নীচে কয়েকটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

বোনার সময়

পশ্চিমবঙ্গে বছরে দুইবার সয়াবিন লাগনো যাবে। বর্ষাকালীন ফসল। হিসাবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে (জুন-জুলাই) এবং শীতকালীন ফসল হিসাবে অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) বীজ লাগানো হয়।

বীজের হার

সারিতে বীজ বপন করলে এক একর জমিতে ২২ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর ছিটিয়ে বীজ বপন করলে এক একর জমিতে ২৮ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বীজ শোধন ও জীবাণু প্রয়োগ

প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা ৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে বীজশোধন করা হয়। নতুন জমিতে বা দুই বছর সয়াবিন চাষ হয়নি এমন জমিতে চাষের জন্য একর প্রতি প্রয়োজনীয় বীজের সঙ্গে ৬০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচার মেশানো হয়। বীজ শোধনের ওষুধ রাইজোবিয়াম জীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকর। এজন্য বীজ বোনার ১ সপ্তাহ আগে বীজশোধন করে রেখে তারপর রাইজোবিয়াম মিশিয়ে জমিতে লাগানো হয়। বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মেশানোর জন্য ২-৩ লিটার জলে ৫০০ গ্রাম গুড় মিশিয়ে আধ ঘণ্টা ফুটিয়ে ঠান্ডা করা হয়। ওই মিশ্রণে এক একর জমির বীজ মিশিয়ে ছায়ায় শুকানোর পর বোনা হয়। ভাতের ঠান্ডা ফ্যান গুড়ের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জমি তৈরি ও বীজ বোনা

জমি ভাল ভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। মাটির ধরন বুঝে জমি চাষ দিতে হবে। ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে এবং জমি ভালভাবে আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। তারপর মাদা তৈরি করতে হবে যেন জমিতে সেচ দিতে বা গাছের পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এ সময়ে মাটিতে ২০ কুইন্ট্যাল কম্পোষ্ট সার একর প্রতি মেশানো উচিত। একর প্রতি ২০ কেজি বীজ ছিটিয়ে কিংবা সারিতে বোনা হয়। বীজ ছিটানোর পর মাটির মধ্যে বীজ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য ভালভাবে মই দেওয়া হয়।

বোনার দূরত্ব

সয়াবিন বীজ জমিতে ছিটিয়ে বপন করা যায়। আবার সারিতে ও বপন করা যায়। তবে বীজ সারিতে বপন করা সবচেয়ে ভালে। সারিতে বপন করলে বর্ষাকালীন ফসলের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪৫ সেমি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি। শীতকালীন ফসলের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি। ৩-৪ সেমি গভীর করে বীজ বপন করতে হবে। আর যদি ছিটিয়ে বপন করা হয় তবে বীজ বপন করার পর জমিতে মই দিয়ে বীজ মাটির সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

জমি তৈরির সময় একর প্রতি ২০ কুইন্ট্যাল কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করা হয়। অম্ল মাটিতে বীজ বোনার কম বা বেশি ৩ সপ্তাহ আগে একর প্রতি ৪-৮ কুইন্ট্যাল ডলোমাইট প্রয়োগ করা প্রয়োজন। রাসায়নিক সার প্রয়োগের সুপারিশ মাত্রা হল একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফেট ও ২৪ কেজি পটাশ, যা মূলসার হিসাবে প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য একর প্রতি ১৭.৫ কেজি ইউরিয়া (বা ৩২ কেজি ক্যান বা ৪০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট), ১৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৪০ কেজি মিউরেট অফ পটাশ মূলসার হিসাবে লাগবে। ফসলের সালফার চাহিদা মেটাতে একর প্রতি ৮ কেজি সালফার প্রয়োগ করতে হয়। ফসফেট সার হিসাবে সিঙ্গল সুপার ফসফেট প্রয়োগ করলে আলাদাভাবে সালফার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। বোরন ঘাটতিযুক্ত এলাকায় একর প্রতি ৪ কেজি বোরাক্স জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে মূলসার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। তরাই, লালমাটি ও বিন্ধ্য পলিমাটি এলাকায় মলিবডেনামের ঘাটতি মেটাতে একর প্রতি ২০০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট মূলসার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মধ্যে আগাছা ও ঘন গাছ তুলে পাতলা করে দেওয়া হয়। প্রতি বর্গ মিটারে ৩৫-৪০টি গাছ রাখা হয়। প্রয়োজনে বীজ বোনার ৬ সপ্তাহ পরে একবার হাত নিড়ান দেওয়া প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক আগাছানাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হলে বীজ বোনার আগে ৯০০ মিলি ফ্লুক্লোরালিন ৪৫% কিংবা বোনার ১-২ দিনের মধ্যে ৫৭৫ গ্রাম মেট্রিবুজিন ৭০%এ বা ৬০০ মিলি ইমাজেথাপায়ার ১০% কিংবা বোনার ১০-১৫ দিন পর ৪০০ মিলি কুইজ্যালোফপ ইথাইল ৫% বা ১৫ গ্রাম ক্লোরিমিউরন ইথাইল ২৫% ২০০-২৫০ লিটার জলে গুলে একর প্রতি প্রয়োগ করা হয়।

জলসেচ

সয়াবিন চাষে ২০-২৫ সেমি জলের প্রয়োজন। প্রাথমিক বাড়ন্ত দশায় অর্থাৎ বোনার ৩৫ দিন পর একটি এবং ফুল আসার পর কমপক্ষে ২টি সেচের প্রয়োজন। ফুল আসার পর ১০দিন অন্তর সেচের সুযোগ থাকলে দেওয়া যাবে।

ফসল তোলা ও ফলন

শুঁটির রঙ সোনালি হলুদ, কালচে বা ধূসর হলে পাকার উপযোগী হয়। কাস্তে দিয়ে মাটির লেভেল বরাবর গাছ কাটা হয়। মেঝেতে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দানা আলাদা করা হয়। কাটার সময় ১৫-১৭ শতাংশ জলীয় অংশ থাকে। সেচ সেবিত স্থানে একর প্রতি ৮০০-১০০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

ব্যাঙে বাজিমাত

ব্যাঙ মাঠের নির্দিষ্ট কিছু পোকামাকড় খেয়ে কৃষিকাজে প্রভূত সহায়তা করে। ব্যাঙের মাথায় থাকা 'পিটুইটারি গ্রন্থি' মাছের প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যায়। ব্যাঙের চামড়া দিয়ে মানিব্যাগ, হাড় দিয়ে মেয়েদের ছোট ছোট গহনা ও বিভিন্ন ধরনের শোপিস তৈরি করা যেতে পারে। ব্যাঙের মাংস প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার। উন্নত দেশের বিভিন্ন রেস্তরাঁ ছাড়াও আফ্রিকার অনেক দেশে নিয়মিত খাবারের মেনুতে থাকে ব্যাঙের মাংস। চাষিরা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এর চাষ করলে লাভবান হবেন। লিখেছেন মেঘালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামোন্নয়ন (কৃষিজ উৎপাদন) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **সৈকত মজুমদার।**

১৫) পুকুর গুলোর উপর জলের লেভেল থেকে একহাত উপরে ১২ হাত দূরে দূরে হলুদ বাল্ব অথবা কেরোসিনের হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখলে পোকা-মাকড় আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসবে। হলুদ রঙ পোকাদের আকৃষ্ট করে খুব তাড়াতাড়ি।

১৬) চাষিরা টিউবিফকস বা সরু সুতোরমত কেচোঁর চাষ করলে ভাল উৎপাদন সম্ভব।

১৭) এই কেচোঁর চাষ করতে হলে চাষিদের পুকুর থেকে কিছুটা দুরে ৩০-৪০ হাত লম্বা এবং দু'হাত চওড়া আর দুই থেকে তিন হাত গভীর করে একটি নর্দমা কেটে তাতে পচা পুকুর বা নর্দমার নীচের গাঢ় মাটি ফেলে দিয়ে এবং সেই জায়গাটায় সবসময় জল দিয়ে একটু স্যাতঁস্যাতেঁ করে রাখতে হবে। তখন এমনিতেই এই কেচোঁ জন্ম নেবে যা ব্যাঙ চাষের জন্য খুব উপকারী হবে।

১৮) এবার নর্দমার কেচোঁ ব্যাঙকে খেতে দিতে হবে।

১৯) চাষিরা যদি এই চাষ না করতে পারেন বা করতে না চান তাহলে বাজারে অ্যাকোরিয়ামের দোকানে এই ধরনের কেচোঁ কিনতে পাওয়া যায়।

২০) মজার কথা স্ত্রী এবং পুরুষ ব্যাঙ দৈহিক মিলনের সময় ডিম ও শুক্রাণু ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব বা কাজ পালন করে না। কিন্তু পরবর্তীতে এরাই ডিম ও ব্যাঙাচি ভক্ষন করে থাকে। এতে উৎপাদন কমে আসতে পারে।

২১) এর পর চাষিদের তাঁদের উৎপাদন বাড়াতে হলে ডিম ছাড়া হয়ে গেল সবগুলো ব্যাঙকে আলাদা করে নিতে হবে ও অন্য পুকুরে ব্যাঙ গুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।

২২) আলাদা করার সময় স্ত্রী এবং পুরুষ ব্যাঙ চিনে আলাদা আলাদা ছোট ছোট ডোবায় রাখতে হবে ও আবার কিছুদিন পর মোটামুটি ৪০-৫০ দিন পর তাদের একসাথে করে দিতে হবে।

শেষ পর্ব

প্রজনন

১) বর্ষা যখন শুরু হবে, সাথে সাথে মেঘের গর্জন ও বৃষ্টিপাত শুরু হলে, যখন ২৫-৩০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা থাকবে তখন স্ত্রী ব্যাঙকে পুরুষ ব্যাঙ আঁকড়ে ধরে ২-৩ ঘন্টা জলে ভেসে থাকে। ২) এরপর স্ত্রী ব্যাঙ ডিম ছাড়বে এবং পুরুষ ব্যাঙ শুক্রাণু ছাড়বে।

৩) এরপর ডিমগুলো ফিতেরমত জলে ভাসতে থাকবে। ২৪ ঘন্টা পর ডিম থেকে ফুটে ব্যাঙাচি বের হবে।

৪) প্রায় ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ব্যাঙাচি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। একটি স্ত্রী ব্যাঙ প্রাকৃতিক অবস্থায় একসাথে ৩-১০ হাজার এবং খামারে চাষাধীন স্ত্রী ব্যাঙ ১-২ হাজার ডিম দিয়ে থাকে।

সতর্কতা অবলম্বন

১) ব্যাঙকে সাপের থেকে দূরে রাখতে হবে। এই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে চাষিভাইদের। কোনওভাবেই ব্যাঙ চাষের জায়গায় সাপ যাতে না ঢুকতে পারে। বিশেষ করে জলাভূমি যেখানে ব্যাঙ চাষ হচ্ছে সেই জায়গা খুব ভাল করে পরিস্কার করে রাখতে হবে। ২) চিল, বাজপাখি যাতে ব্যাঙ ধরে নিতে অথবা উপদ্রব করতে না পারে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৩)কোনো রকম সাবান গোলা জল, ড্রেন বা নর্দমার নোংরা জল বা কোনও প্রকার পচা জল কোনওমতেই পুকুরে ব্যাঙ চাষের জায়গায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না।বাজারজাতকরণ:ব্যাঙ মোটামুটি ৯ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যেই বড় হয় ও চাষিরা তা বাজারে বিক্রি করতে পারেন। চাষিদের প্রথমে পুকুর বা জলাভূমি বা ডোবা থেকে কিছু ব্যাঙ তুলে বিক্রি করে দিতে হবে। তারপর বাকি ব্যাঙ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে। তা না হলে ব্যাঙের বৃদ্ধি ভাল হবে না। এর পর দু'বছর পার হয়ে গেলে খামারের সব ব্যাঙ বিক্রি করে দিতে হবে। ব্যাঙ তিন বছরের বেশি বাঁচে না এবং তারপর ব্যাঙের মাংস শক্ত হয়ে যাবে, যার বাজার মূল্য ভাল হবে না।